ঐতিহ্যমন্ডিত জনপদ সুখচর

ড: শেখর শেঠ

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত গ্রাম সুখচর। ভাগীরথীর পূর্বতীরে উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুর মহকুমার অধীন খড়দহ থানার প্রেক্ষাপটে সুখচর এক অতি প্রাচীন জনপদ। এই জনপদটি পানিহাটি পৌরপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। কলকাতা থেকে প্রায় ১৪ কিমি উত্তরে সোদপুর স্টেশনে নেমে এই গ্রামে আসার অটোর ব্যবস্থা আছে।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মনসা মঙ্গল কাব্যে ভাগীরথী পূর্ব পশ্চিমের গ্রাম বা জনপদের সঙ্গে সুখচর গ্রামের উল্লেখ আছে। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হয়ে সাগর সঙ্গমের দিকে অগ্রসর হবার সময় যে গ্রামগুলি পথে পড়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। "পথে পড়িতেছে, অজয় নদী, উজানী, শিবানদী (বর্তমানে শিয়ালনালা), কাটোয়া ইন্দ্রানী নদী— ইন্দ্রঘাট, নদীয়া ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কুমারহাট, ডইনে হুগলী, বামে ভাটভাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাঁকিনাড়া, তারপর মূলাজোড়া, গারুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানি, বামে ইছাপুর, বাকি বাজার, ডাইনে নিমাইতীর্থ (বর্তমানে বৈদ্যবাটি) চাণক, মাহেশ, (বামে) খড়দহ-- শ্রীপাট, ডাইনে রিসড়া (রিষড়া), বামে সুখচর, পশ্চিমে কোন্নগড়, ডাইনে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ (এড়েদহ), পশ্চিমে যুষুড়ি, তারপরে পূর্বকূলে চিত্রপুর (চিৎপুর) কলিকাতা, পশ্চিমকূলে বেতড়, তারপর (বামে) কালীঘাট, চাড়াঘাট, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাতিয়াগড়, চৌমুখী, শর্তমুখী এবং সর্বশেষে সাগর সংগমতীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পবিত্র তর্পণ"।

ইংরাজ রাজত্ব কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী গ্রামগুলি ধীরে ধীরে উল্লেখ যোগ্য হয়ে ওঠে বেশী মাত্রায়। ১৭৯৩ সালে

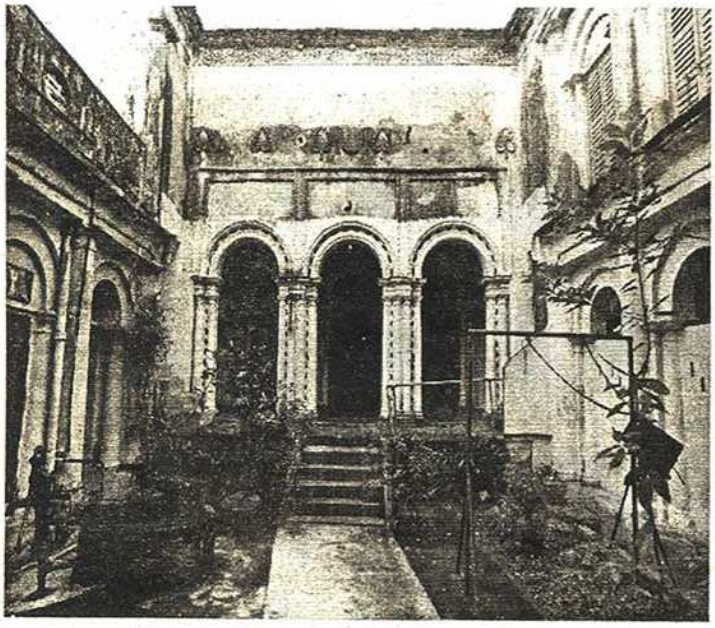

সুখচর ঐতিহ্যের স্মারক নরসিংহ দত্ত ঘাট
রোডের নিকট বনেদি বাড়ির ঠাকুরদালান 'কালী ভবন'।

চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সুখচর শোভাবাজারের রাজ পরিবারের জমিদারীতে পরিগণিত হয়েছিল। এই পরিবারের রাজা নবকৃষ্ণ

সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, সুখচর।

দেববাহাদূর ও পরবর্তী বংশধর রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের উল্লেখ বাংলার ইতিহাসে দেখা যায়।

গুড় থেকে চিনি উৎপাদনের ব্যস্ত সমস্ত কেন্দ্র তখন সুখচর। কলের সাদা চিনি আবিষ্কার হয় নি। কাশীর বিশ্বেশ্বরের নিত্য পুজো থেকে বাণিজ্যিক ভাবে বাটাভিয়া (ইন্দোনেশিয়া) পর্যন্ত সুখচরের লাল চিনির কদর। গঙ্গা তীরের এই ব্যবসা তখন গমগম করছে। বাণিজ্যকেন্দ্রের পাশে নদীর তীর ঘেঁষে মস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করেন রাধাকান্ত। সুড়ঙ্গ দিয়ে গঙ্গা জল প্রবেশ করানো হত। পরিবারের লোকজনের স্নানের ব্যবস্থার আড়াল ছিল এ ভাবেই। জমিদার পরিবারের প্রতি সম্মান জানাতে, তারই তালুকদার সোদপুরবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশে একটি ঘাট নির্মাণ করান। চাঁদনি— সহ এই ঘাটটি চলতি নাম 'বাজারপাড়ার ঘাট'। চাঁদানির গায়ে পঙ্খের নানা কারুকার্য ছিল। দেব বাহাদুর ১৮৬৩ সালে বৃন্দাবন রওনা দেন এবং ওখানেই তার দেহান্ত হয়।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিক থেকেই এই জনপদ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারদের কাছারী বাড়ীর কাছে বড় ধরনের বাজার গড়ে ওঠে। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির জন্য এই বাজারে বহু ধরনের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ ও খাদ্রদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হতে থাকে। আগে যে হলুদ রঙের মিহি চিনি পুজোয় লাগতো তা সরবরাহ হত এইখান থেকেই। একসময় সুখচর ছিল পূর্বভারতের অন্যতম বৃহৎ চিনি উৎপাদন কেন্দ্র। আজও বারানসীর ঘাটে সুখচরের চিনি নামে সেই ধরনের চিনি তৈরী হয়। মূলতঃ আখের রস জ্বাল দিয়ে এই চিনি তৈরী হতো। তাই একে লাল চিনিও বলা হতো। সুখচর সুখের চর ছিল কিনা তা জানা না গেলেও এটি প্রমাণিত যে এই গ্রাম একসময় দেশী চিনি বা শর্করা তৈরীর জন্য বিখ্যাত ছিল। তার থেকেই শুকচর শব্দটির উৎপত্তি। চিনির মিষ্ট স্বাদের জন্য সুখের অনুভূতি হয়। সুখচরের নামকরণের যথার্থতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকেই বলছেন চিনি তৈরীর কেন্দ্র ছিল বলেই একে সুখচর বলা হয়ে থাকে। আবার অন্যমতে ভাগীরথির চরে সুখী পরিবারদের বসতি হওয়ায়, লোক মুখে স্থানটি পরিচিত হয় 'সুখচর' / সু নামে। আবার কারও মতে ভাগীরথীর

শুকনো চরে গড়ে ওঠার ফলে স্থানটির নাম হয় 'শুকচর'।

সুখচরের চিনি শিল্প প্রসঙ্গেও প্রবীণদের স্মৃতিকে নির্ভর করেই এগোতে হয়েছে। এদের মধ্যে শ্যামব্রহ্মা শেঠ তিনি-চিনি তৈরীর বিষয়ে কিছু তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর মতে, পুকুরের তলার এক ধরনের বিশেষ ঘাস আখের রস জ্বাল দেওয়ার সময় মিশিয়ে দেওয়া হতো। বিশাল মাপের লোহার কড়াইতে আখের রস জ্বাল দেওয়া হতো। মূলতঃ তারই পূর্বপুরুষ রাম শেঠ আনুমানিক চারশ বছর আগে সুখচরের গঙ্গার ধারে চিনি তৈরীর কারখানা তৈরী করেন। পরবর্তীকালে তার বংশধর বনমালী শেঠ, কেদার শেঠ ও কালী শেঠ একাদিক্রমে চিনি তৈরীর ব্যবসা করে এসেছেন। চিনি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে শেঠ পরিবার প্রভূত আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর এদের বাগান বাড়ীও ছিল। চিনি তৈরীর পাশাপাশি শেঠেরা চালও তৈরী করতেন। বর্তমানে সুখচর বাজার ঘাটের কাছে শেঠদের একটি বাড়ীতে এ ধরনের একটি ধানকলও ছিল। চিনি তৈরী হতো চারটি কারখানাতে। তবে তেঁয়রপাড়া মাঠের কাছে এদের একটি বাড়ীতে এখনও চিনি জ্বাল দেবার সারিবদ্ধ উনুনের নিদর্শন ও বিশাল কড়াই অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। মূলতঃ ১৯৩৩ সালে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে কালী শেঠ প্রয়াত হন। এদিকে বাজারে রাসায়নিক চিনির প্রচলন হতে থাকায় দেশী চিনির ব্যবসাও সংকটে পড়ে। শেঠ পরিবার ছাড়াও ডঃ নীলমনি চ্যাটার্জী, সাঁতারা পরিবার, নাগ পরিবারসহ গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়ীতে দেশী চিনি তৈরী হতো। এখনও সুখচরের কালীতলার মঙ্গল গুই-এর মিষ্টির দোকানে বছরের বিভিন্ন সময়ে এই লাল চিনি তৈরী হয়।

চিনি শিল্প ছাড়াও সুখচরে ধান, চাল, তেল, কাপড়ের বস্ত্র উল্লেখযোগ্য। যাতায়াতের সুবিধার জন্য অনেক দূর থেকেও এইখানে আসতেন জিনিসপত্র কেনার জন্য।

নদীপথে বা জলপথে সুখচরের অবস্থানের সুবিধা এবং পূর্ববঙ্গের যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখানে বিভিন্ন পণ্যের বাজার গড়ে ওঠে। ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে সুখচরের জনবসতির একটি সুষম সমন্বয় গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। যেমন কলু পাড়া, তেঁয়র পাড়া, কাঁসারী পাড়া, বাজার পাড়া, ঘোষ পাড়া, মিত্র পাড়া, পঞ্চাননতলা, সাপুড়ী তলা ইত্যাদি। নৌকা এবং পরবর্তীকালে লঞ্চ তৈরীর (গীতা গাঙ্গুলী) কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়। এখানে তেঁয়র পাড়ায় সারি সারি নৌকার দৃশ্য, গঙ্গায় মাছ ধরার স্মৃতি এবং গঙ্গায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার উন্মাদনা এখনো বয়স্ক মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এছাড়াও সুখচরের ফুটবল ক্রীড়া, যাত্রা অনুষ্ঠান, নাচ-গান ও পূজা পার্বণে গ্রামবাসী একত্রিত উদ্‌যাপন উল্লেখযোগ্য। চারিদিকে গাছপালা, জলাশয় এবং নদীর তীরবর্তী শোভা কলকাতার অনেক মানুষকে আকর্ষিত করে এবং একাধিক বাগানবাড়ী ও আশ্রম গড়ে ওঠে।

পানিহাটি, সোদপুর, খড়দহ অঞ্চলে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রভাব বাংলা তথা ভারতের শিল্পায়নে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। এই অঞ্চলে শেঠ পরিবারের জমিতে গড়ে উঠেছিল অনেক শিল্প যেমন কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং, বি. টি. রোডের ধারে সোদপুর পটারিস, বেরী ব্রাদার্স, মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্যালকাটা সিল্ক মিল এবং পরবর্তী কালে হিন্দুস্থান ওয়ার ইত্যাদি। এইগুলির অধিকাংশই আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

সংস্কৃতিবান ও শিক্ষানুরাগী জমিদার রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের উৎসাহে সুখচরে "টোল" প্রতিষ্ঠিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। তার নিদর্শন ও সাক্ষ্য বর্তমান। উপরে উল্লেখিত শতাব্দীর শেষভাগে সুখচরে হিতৈষণী বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি সংবাদ থেকে। ১৮৯৬ সালের ১৩ই অক্টোবর স্টেটসম্যান সংবাদপত্রে এ-টি প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এখানে উল্লেখিত।

The weather is fine but the heat is still intense. We expect fine weather during the Puja days. Then vernacular Scholarship examination commenced on 30th ultimo and 2nd instant. 4 students appeared from Khardah M. V. School, 4 from Panihati M. V. School and 3 from Sukchar Hitaisani School.....

এছাড়াও সুখচরে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য স্বরণ করা যায় স্বর্গীয় নলিনদেব বিশ্বাস, যার অবদান সুখচর গ্রামে স্বরণীয়। নলিন দেব বিশ্বাস-এর বাড়ি সুখচর নরসিংহ দত্ত ঘাট রোডে অবস্থিত ছিল শেঠের বাড়ি দালানের পূর্ব প্রান্তে। এই বাড়িতে এবং নিকটবর্তী পঞ্চাননতলায় শেঠেদের আর একটি বাড়ীর পূজার দালানে মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বিদেশিনী ইংরেজ মহিলা শিক্ষিকারাও এখানে পড়াতেন।

Ver nacular Scholarship এর পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যেই ১৯০৩ সালে সুখচর শিবতলা বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণে প্রয়াত ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র শেঠ মহাশয়ের দান ও বদান্যতা বিদ্যালয়ের ফলকে উল্লেখিত আছে। স্মৃতি নির্ভর যাঁদের নাম পাওয়া যায় শেঠ মহাশয় ছাড়াও প্রয়াত শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী ও কালিপ্রসন্ন ঘোষাল মহাশয়রা এই বিদ্যালয়ের গোড়া পত্তনের সময় ও পরে যুক্ত ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে প্রয়াত জীবন কৃষ্ণ দাস, নলিনীকান্ত বল এবং অমূল্য মাইতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পানিহাটি পৌরসভার ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ১১,০০০। ৬টি মূলগ্রামে এই সংখ্যা ছিল বিভক্ত। ভাগীরথীর উপকূলে জনসংখ্যা বেশী, হাজার দুয়েক মত ছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৯০০

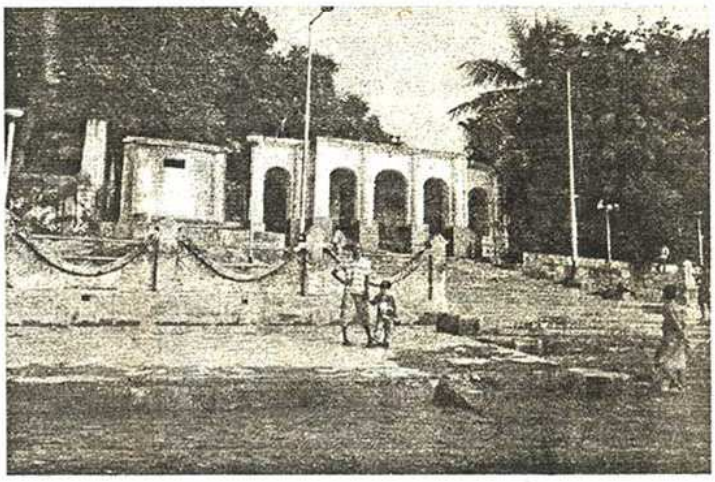

সুখচর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কাছারি বাড়ি সংলগ্ন বাজার পাড়া ঘাট। এই ঘাট দিয়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কাশী গমন করেন।

সাল থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ক্লাব, বিদ্যালয় ও পাঠাগার গড়ে ওঠে। এককভাবে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের চিন্তাভাবনা না করে একই পৃষ্ঠপোষক ও সংগঠক একই সমাজভুক্ত শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন গোষ্ঠীই উদোগী হতেন। এই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ পাওয়া যায় অগ্রণী মানুষগুলির নামগুলি যদি পরীক্ষা করে দেখি প্রথম দিকের তিন দশক পর্যন্ত। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শিবতলা বিদ্যালয় ও পাঠাগারের জন্য জমি

হস্তান্তরের দলিলে দেখা যায় সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির সেবাইতদের পক্ষে জমিটি দানের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশধর তরফদার, কালীপদ শেঠ, যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল, সত্যহরি নন্দী, বনমালী দে প্রমুখ। এঁরা সকলেই পর্যায়ক্রমে ঐ সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া ঐ দশকের শেষ দিকে আর একজন সংগঠকের নাম উল্লেখ না করলে অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি হলেন প্রয়াত নলিন দেব বিশ্বাস মহাশয়। পরবর্তী কালে বিদ্যালয় পরিচালনায় আরো যাঁদের নাম স্মরণীয় তাঁরা হলেন —প্রয়াত যতীন্দ্র নাথ ঘোষাল, দাশুরথী সেন, কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, কিশোরী লাল মিত্র, হরিচরণ ব্যানার্জী, হৃষিকেশ ঘোষ, ভূপতি চ্যাটার্জী, বটকৃষ্ণ শেঠ, সতীশ চন্দ্র দাস ও জগৎব্রহ্ম শেঠ।

পঞ্চাশের দশকে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির বিশেষ চেষ্টায় সুখচর বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সমিতির সহঃ সম্পাদক প্রয়াত জগৎব্রহ্ম শেঠ মহাশয়ের পিসিমার বাড়ীটি যা তিনি বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। ৮/১০ কাঠার উপর চারটি ঘর সমেত বাড়ীটি পেয়ে সুখচর বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পিসীমার বাড়ি দানের ক্ষেত্রে আরও যাদের অবদান রয়েছে তাদের কথা না উল্লেখ করলে অসম্পূর্ণ থাকে, তাঁরা হলেন পিসীমা গৌরী দাসী যিনি বিধবা হয়েছিলেন ১১ বছর বয়সে এবং মাতা দুর্গারানী শেঠ যিনি বিধবা হয়েছিলেন ২৫ বছর বয়সে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রয়াত পূর্ণব্রহ্ম শেঠ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী রামব্রহ্ম শেঠ ও প্রয়াত শ্যামব্রহ্ম শেঠ।

সুখচর গ্রামের পাঠাগার ঃ

সুখচর গ্রামের পাঠাগারের গোড়াপত্তন হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে ইংরাজি ১৯০৪ সালে (বাংলা ১৩১১ সাল)। তখন এর নাম ছিল ইয়ংমেন্স্ লিটারেরি অ্যাসোসিয়েশন। কলকাতা শিক্ষার পীঠস্থান। তার ঢেউ এসে লাগল সুখচরের কয়েকটি কিশোরের মনে। একটা কিছু করা দরকার। যার মধ্যে দিয়ে জনসেবা, শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব। স্থির হল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা। ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু হল। সংগ্রহ হল রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ চেয়ে চিন্তে। কিন্তু আরোও বই চাই। চাই অর্থ। নিজেদের উদ্যোগে কেনা হল নতুন পুরানো বই, পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করতে। এই সব উৎসাহী কিশোরদের পাশে এসে প্রথম যিনি দাঁড়িয়েছিলেন গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরের বছর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে পুলিশ এল পাঠাগারে। পাওয়া গেল বোমা তৈরির ফরমুলার কাগজপত্র। তছনছ হল বইপত্র। সরকার বিরোধী চিহ্নিত নিষিদ্ধ বইগুলি সরিয়ে রাখতে হয়েছিল। পুলিশের জুলুমের পর যে বই বেঁচে রইল তাই নিয়ে পাঠাগারের পুনরায় কাজ শুরু হল কার্তিক চন্দ্র পালের বাড়িতে। 'অনুশীলন সমিতি' যোগাযোগ করে পাঠাগারের সভ্যদের সঙ্গে। লাঠি খেলা, ছোড়া খেলার পাঠ চলে দিনের পর দিন। এর পর পাঠাগার স্থানান্তরিত হল কালীপদ শেঠ-এর বৈঠকখানা ঘরে ও পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেউরির দোতলায়। সময়টা ১৯১৯ সাল। নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের জন্য চলল অর্থ সংগ্রহ। কালীতলায় নির্মিত হল একতলা গৃহ। এই নির্মাণ কাজে বিনোদিনী দে একখন্ড জমি দান করেন। এছাড়া এই কর্মযজ্ঞের অংশীদার ছিলেন ডাঃ গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস নাগ এবং গ্রামবাসীরা। এদের উদ্যোগে বাড়ি নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। এই বাড়িতে সকালে/দুপুরে বসতো সু াচর বঙ্গবিদ্যালয় নামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। রাত্রে চলতো পাঠাগারের কাজকর্ম। শশধর তরফদার যিনি এই সুখচর গ্রামের উন্নতিকল্পে অকাতর পরিশ্রম করে অকালে কালের কবলে নিপাতিত হয়েছিলেন, তাঁরই নাম চিরদিন অক্ষুন্ন রাখবার জন্য এই এসোসিয়েশনের সভ্যদের ও গ্রামের অধিবাসীদের মতানুসারে গ্রন্থাগারের

মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় গোবিন্দ দত্ত
শ্রী চৈতন্যের মূল কীর্তনিয়া প্রতিষ্ঠিত মূর্তি।

নাম 'সুখচর শশধর পাঠাগার' রাখা স্থির হয়। ফলে ১৯২৭ সালের ২১ আগষ্ট গ্রন্থাগারের নাম 'ইয়ং মেন্স লিটারেরি এসোসিয়েশন' এর পরিবর্তে 'সুখচর শশধর পাঠাগার' নামকরণ করা হল।

পাঠাগার খোলা থাকে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার বন্ধ। রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত খোলা। এখানে ভর্তির জন্য দিতে হয় ৩২ টাকা এবং মাসিক ১ টাকা। ছোটদের জন্য আছে কিশোরভারতী বিভাগ। সেখানে ভর্তির জন্য দিতে হয় ১২ টাকা, মাসিক চাঁদা কিছুই দিতে হয় না। এখানে পুরানো পত্র-পত্রিকার মধ্যে ভারতবর্ষ, যুগান্তর, দেশ, প্রবাসী ইত্যাদি আছে। পাঠকদের উপন্যাস, ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণ কাহিনী বই-এর চাহিদাই বেশি। বর্তমানে লাইব্রেরি পরিচালনার জন্য একটি কর্মসমিতি আছে। সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান লাইব্রেরির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীটি জরাজীর্ণ, সংকীর্ণ পরিসর।

পাঠাগার সম্পর্কে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অনেকেই উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন—

'শশধর পাঠাগার দেখলাম অনেক দিনে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠান। পঠন পাঠন অধ্যায়ন না করলে সমাজকে গড়া যাবে না। ....জ্ঞান লাভ করতেই হবে। যেমন করেই পার। জ্ঞান বল, কর্ম বল তার সঙ্গে ত্যাগের বলে বলিয়ান হলে তবে মহৎ হতে পারবে, জাগো উঠে পড়ে লাগো। সকলের সঙ্গে মত মিলিয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানের বাতি জ্বালাও।' (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ০৯/০৫/১৯৪৮)

'অদ্য সুখচর শশধর পাঠাগার পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। পাঠাগারের পুস্তক তালিকায় অনেক মূল্যবান পুস্তক ও আছে দেখিলাম। লোক শিক্ষার বাহন হিসাবে এই রূপ পাঠাগারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পাঠাগারের যুবক কর্মীগণের উৎসাহ ও শিক্ষা আশা জনক। আমি এই পাঠাগারের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।' সমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ, ২৩/০৪/১৯৫৫; শ্রী ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৩/০৪/১৯৫৫, সম্পাদক/ভারতবর্ষ)।

'পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে বলেই ঐতিহ্যের গৌরবে শশধর পাঠাগারে বার্ধক্যের পরিবর্তে নব যৌবনের জোয়ার আসা উচিৎ।' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১/১০/১৯৫১)।

'সুখচর শশধর পাঠাগারে গ্রন্থ সংগ্রহে দেখে আনন্দিত হলাম। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৫০ বছরের ঐতিহ্য জড়িত এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের কাজে শশধর পাঠাগার পরম সহায় হয়ে উঠুক এই কামনা করি। (নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩০/০৬/১৯৫৬)

শশধর পাঠাগারে আসিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। সুখচরের অনবদ্য কীর্তি এই পাঠাগার। আরও উন্নতি করুক এই কামনা করি। (বনফুল, ২২/০৯/১৯৭৪)।

সুখচরের গর্ব ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতার নাম ডাঃ নীলমাধব চট্টোপাধ্যায়। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধানে ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ১৮৭৩ সালে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষক ও সমাজসেবী। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি ও ব্যাকটিরিওলজির সহকারী অধ্যাপক ও পরে সরকারের সহকারী ব্যাকটিরিওলজিষ্ট হন। ১৯১৭ সালে কালাজ্বরের মৌলিক গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হন। ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা সম্পর্কেও তিনি গবেষণা করেন। বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি সমাজসেবার জন্য সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি গঠন করেন। সারা বাংলায় এর শাখা বিস্তার করেন এবং সোসাইটির মুখপত্র 'সোনার বাংলা' সম্পাদনা করেন। মৎস চাষ ও নদী সংস্কার বিষয়ে মুল্যবান প্রবন্ধ রচনা ও স্বগ্রামে কুটীর শিল্প সমিতি স্থাপন করেন। বিজ্ঞানচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ লন্ডনের রস ইনষ্টিটিউটের ফেলো নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ১২ বছর পানিহাটির পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনাবলী 'রোমান্স অব দ্য গ্যাঙ্গেটিক ডেলটা', মডার্ন সায়েন্টিফিক অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কো-অপারেটিভ ওয়াটার সাপ্লাই' এবং 'কো-অপারেটিভ মার্কেটিং, ডেয়ারিং হোম ক্রাফটিং অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাসট্রি'।

সুখচরের ধর্মীয় ঐতিহ্য ঃ

পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী সুখচর পানিহাটি ও খড়দহ অঞ্চলে গঙ্গারতট বরাবর ঘাটের সংখ্যা বারানসীর পরে আর কোথাও নেই। শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস বিহারী, আন্তর্জাতিক নিম্বার্ক সমিতির সভাপতি এবং সুখচর কাঠিয়া বাবা আশ্রমের মত অনুযায়ী এই অঞ্চলটি পূর্ব কাশীধাম হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। গঙ্গার তীরবর্তী মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব ও প্রভু শ্রী নিত্যানন্দ দেবের লীলা ধাম ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পুণ্য পরশে এই অঞ্চলটি ধন্য।

মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব ও প্রভু শ্রী নিত্যানন্দ দেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম পার্শ্ববর্তী খড়দহ ও পানিহাটিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুখচর জনপদেও তা প্রসারিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যেও এ বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়। এছাড়াও শাক্ত, শৈব্, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের বিবরণ নিচে দেওয়া হল—।

১) সুখচর কালীতলা (শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা) ঃ এই গ্রামেরই গ্রাম্যদেবী শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা ঠাকুরাণী। পূর্বে জায়গাটি তুঁতগাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ওই সময় শিব লিঙ্গটি পাওয়া যায়। তাই 'তুঁতেশ্বর শিব' নামে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ও সিদ্ধেশ্বরী দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। পরে স্থানীয় গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন এক পূর্বপুরুষ শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালিমাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করান। শিলা লিপিতে জানা যায় ১৯০১ সালে হেমাঙ্গিনী দেবী এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তিটি নবরুপে প্রতিষ্ঠা করেন ভক্ত গোপাল চন্দ্র দে ও তার পত্নী বিনোদিনী দাসী ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। মন্দির অভ্যন্তরে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি ও পদতলে রয়েছেন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শ্বেতপাথরের শিব। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিদ্ধপীঠ সাধকের একান্ত কামনায় জ্যোতির্ময়ী। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই দেবীতীর্থে পূজা অর্চনা। এই মূর্তিতে অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্তমান। মায়ের মাহাত্ম্যে আপ্লুত এলাকার জনসাধারণ। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহায়তায় পরবর্তীকালে মন্দিরের সামনে প্রশস্ত চাতাল ও নাট মন্দির তৈরী হয়। ১৯৪৪ সাল থেকে এখানে বারোয়ারী দুর্গাপুজা চালু হয়। বর্তমানে আদালতের রায় অনুসারে এই মন্দিরটি জনগণের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত এবং স্থানীয় জনসাধারণ নিজস্ব উদ্যোগে সুখচর কালীতলার এই মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

২) রাধাকান্ত মন্দির ঃ

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গৃহ দেবতা রাধাকান্ত বিগ্রহটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অবস্থায় এই গ্রামে অবস্থান করত। পরবর্তীকালে স্থানীয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাসীর সাহায্যে তার মাতা সুরিনী দেবীর ইচ্ছা অনুসারে ৮ ই আগষ্ট, ১৯০৮ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে কষ্টিপাথরে তৈরী কৃষ্ণবিগ্রহ সহ অষ্টধাতু নির্মিত রাধামূর্তি নিত্য পূজিত হয়। এই মন্দিরটির অবস্থান সুখচর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির সংলগ্ন।

৩) পাইনদের বাগানবাড়ি ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির ঃ

সুখচর পঞ্চাননতলায় নরসিংহ দত্ত ঘাটের পার্শ্ববর্তী উত্তর প্রান্তে গঙ্গার তীরে প্রচুর বৃক্ষশোভিত এই বাগানবাড়ি। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পাশেই রাসমঞ্চ। সুখচরের পাইন বাড়িতে ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১৯ শে মাঘ শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বিহারী লাল পাইন ছিলেন কলিকাতা বন্দরের ক্লিয়ারিং এজেন্ট। কলিকাতা পুলিশের বর্তমান সদর কার্যালয় লাল বাজারের বাড়ীটি ছিল তাঁর গুদাম খানা। সমস্ত মাল জাহাজঘাটা থেকে এই গুদামে আসত। সেখান থেকে তা প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হতো। এই পাইনদের প্রধান বাস সুখচরে। মন্দির অভ্যন্তরে কষ্টিপাথরে নির্মিত কৃষ্ণ ও অষ্টধাতু নির্মিত রাধা ছাড়াও আছে নারায়ণ শিলা, গোপাল ইত্যাদি। বহিঃভাগের বামদিকে পাথরের করজোড়ে হনুমান মূর্তি এবং ডাইনে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধমূর্তিটি খুবই প্রাচীন। এইরকম বুদ্ধমূর্তি খড়দহ /সুখচর / পানিহাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রচুর আছে। এখানেই তাঁরা সুদৃশ্য রাসমঞ্চসহ রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নিত্যসেবার পাশাপাশি মন্দিরে পাইনদের বর্তমান বংশধরেরা রাসযাত্রা, মাকুড়ী সপ্তমী, জন্মাষ্টমী ও দোলপূর্ণিমার দিন বিশেষ উৎসব সংগঠিত করেন। বিজলী আলো সরবরাহ না হওয়ার আগে এখানে প্রতি বছর জেনারেটর দিয়ে আলো জ্বালিয়ে যাত্রা ও অন্যান্য কীর্তনের অনুষ্ঠান হতো। বি. টি. রোড এ গীর্জার স্টপেজে নেমে গঙ্গারধারে পৌছালে এই রাধাকৃষ্ণ মন্দির পাওয়া যায়।

৪) শ্রী গৌরাঙ্গ ও শ্রী নিত্যানন্দের প্রাচীন দারু-বিগ্রহঃ গোবিন্দ দত্ত - মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দেবালয়ে সুখচরের গর্ব ও ঐতিহাসিক নিদর্শন এই বিগ্রহ। মহাপ্রভুর কীর্তনীয়া ছিলেন গোবিন্দ দত্ত। ৫০০ বছর পূর্বের ইতিহাস। পুরীতে রথযাত্রায় তিনি কীর্তনের মুলসঙ্গী ছিলেন। ইনি পদকর্তাও ছিলেন এবং পাখোয়াজ/খোল বাজাতেন। সুখচর গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের জীবদ্দশায় তাঁদের দারু প্রতি মূর্তি নির্মাণ করে গোবিন্দ দত্ত সেই দুটি মূর্তি সুখচরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতেন। এখন ঐ দারু বিগ্রহদ্বয় মিলন সংঘ মাঠের দক্ষিণ-প্রান্তে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দেবালয়ে পুজিত হচ্ছেন। গোবিন্দ দত্ত অবশ্য শেষ জীবনে বৃন্দাবনে বাস করতেন। বর্তমানে কীর্তনের পুনরায় জাগরণের সময় গোবিন্দ দত্তের অবদান বিশেষ উল্লেখ রাখে। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্তমান যুগের বিখ্যাত সাধক ও সঙ্গিতকার ভবাপাগলারও স্মৃতি এই ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

দেউল পোতা সাঁপুড়েতলা ক্যাম্প ঘাটের সন্নিকটে অবস্থিত ৩০০ বছরের পুরনো অবহেলিত শিবমন্দির অবলুপ্তির পথে।

৫) নতুন কালী বাড়ী মন্দির ঃ

সুখচর কলুপাড়া রোড ধরে এগিয়ে ডানদিকে হরিপদ সাঁতরা রোড ধরে গঙ্গার নিকটে এই মন্দিরের অবস্থান স্থল। শ্রীশ্রী জ্যোঁতির্ময়ী কালী নামে খ্যাত এই মন্দিরটি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরটির অলংকরণ ভিন্ন ধরনের। শঙ্কু আকৃতির পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট এই মন্দিরটি দেশী ও বিদেশী মিশ্রণে তৈরি। সম্মুখে আছে নাট মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ অষ্টধাতুর তৈরি রাধা-মাধব, গোপাল, শাল গ্রাম শিলা সহ বিভিন্ন দেব দেবীর নিত্য পূজা হয়। ভোলানাথ রুপী শিব পূজিত হচ্ছেন পৃথক মন্দিরের বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় রীতিতে বিভিন্ন উৎসবাদি পালন করা হয়। বর্তমানে চট্টোপাধ্যায় বংশ, বংশ পরম্পরায় এই মন্দিরের সেবাইত।

৬) সুখচর বারো মন্দির ঘাট ঃ

সুখচরের দক্ষিণপ্রান্তে পানিহাটি অঞ্চলের ভবানীপুরের হরিশচন্দ্র দত্ত ঘাটের পাশে ১২১৩ বঙ্গাব্দে নির্মিত এই বারোটি শিব মন্দির বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার নীলমনি মিত্র এবং স্যার বাডফোর্ড লেসলির পরিকল্পনানুসারে নির্মিত হয়। প্রতিটি মন্দিরেই নীলকণ্ঠী কষ্টিপাথরের লিঙ্গ আছে।

৭) বালক ব্রক্ষমচারী ধাম ঃ

সুখচর নরসিংহ দত্ত ঘাটের লাগোয়া এই ধাম পূর্বে মল্লিক বাড়ী নামে পরিচিত ছিল। এইখানে আছে তিনটি শিব মন্দির—অত্যন্ত মনোগ্রাহী। এক সময়ে দূর দুরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ এই ধামে আসতেন বালক ব্রক্ষচারীর আকর্ষণে। রাম নারায়ণ রাম সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠতো এই অঞ্চলটি। বর্তমানে অবশ্য সেই উন্মাদনা অনেক স্তিমিত।

শ্রীশ্রী ভোলানন্দ মঠ ঃ

সুখচরের উত্তর প্রান্তে খড়দহ পৌরসভার অন্তর্গত এই মঠ অবস্থিত। স্বামী ভবানন্দগিরি কর্তৃক ১৯১৩ সালে এই মঠ স্থাপিত হয়। মঠে কাশীশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং শ্রীশ্রী ভোলানন্দ স্মৃতি মন্দির বিদ্যমান। ১৯২৯ সালে স্বামী ভোলানন্দগিরি হরিদ্বারে দেহবসানের পূর্বে ১৯২৮ সালে কাশীশ্বর মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। ভোলানন্দ স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালে। মঠ পরিচালিত হয় হরিদ্বারের মূল কার্যালয় থেকে। এখানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৮) কাঠিয়া বাবা আশ্রম- সুখচর ঃ

সুখচরের উত্তর প্রান্তে পঞ্চাননতলা ঘাট সংলগ্ন গঙ্গার তীরে এই আশ্রমটি অবস্থিত। এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী। ১৯৬৪ সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান প্রধান উঃ বৃন্দাবান বিহারী দাস আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। দেশে ও বিদেশে ভারতের মানবিক আদর্শের সাহায্য প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত। বহু ভক্ত ও শিষ্য নিরন্তর পথ নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা পেয়ে উপকৃত। অতি মনোরম পরিবেশে মন্দির সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। রয়েছে -- গোশালা, পাঠাগার ও অতিথিশালা ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র। নিত্য পূজা ও আরতি অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন তিথিতে বিশেষ পুজা ও ভোগ উৎসব হয় ও দূর-দুরন্ত থেকে ভক্ত সমাগম হয়।

৯) ভবাপাগলা আশ্রম ঃ

বর্তমান কালের বিখ্যাত সাধক ও সঙ্গীত রচয়িতা ভবাপাগলা। ভবাপাগলা সাধন সঙ্গীত আজ অনেক ভক্ত মানুষের অনুপ্রেরণা। সুখচরের উত্তর প্রান্তে গঙ্গার তীরবর্তী ক্যাম্পের ঘাটের কাছে সুখচর ভবাপাগলার আশ্রম। এই আশ্রম গড়ে উঠেছে ভবাপাগলার ইচ্ছানুসারে ইংরেজী ৫ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ পত্রে যা প্রকাশ পায়। এই আশ্রমের কর্ণধার স্বামী সোমেসারনন্দ গিরি মহারাজ। যিনি ছাত্রাবস্থা থেকে ভবাপাগলার নিত্যসঙ্গী এবং পাগলের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁর কাছেই কাটিয়েছেন। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ভবার ভবদারা মূর্তি, শিব, রাধাকৃষ্ণ, ভবাপাগলার মূর্তি। এছাড়াও রয়েছে একটি নাটমন্দির। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং অনেক ভক্ত সমাগম হয়। ভবাপাগলার মরমী সঙ্গীত অনুষ্ঠান মানুষকে আপ্লুত করে। ফাল্গুন মাসের শেষ শনিবার ভবাপাগলার নির্দেশিত বিশেষ শুভ দিন। ঐ দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। এই আশ্রমে দুর্গাপূজা নিষ্ঠাসহকারে পালিত হয়। অনেক কল্যাণ কর কর্ম সুচী এবং ভবাপাগলার ভাবধারার প্রচার সারা বছর ধরে করা হয়।

পথনির্দেশঃ ট্রেনযোগে—শিয়ালদহ - বারাকপুর মেন লাইন খড়দহ স্টেশন নেমে রিক্সা ১০/১৫ মিনিটের পথ, অথবা সোদপুর স্টেশন হতে সুখচর সম্মিলনী ক্লাব অটোরিক্সায়। গঙ্গা-কিনারে ভবাপাগলার আশ্রম। বাসযোগে- শ্যামবাজার-বারাকপুর (বি. টি. রোড) বাস রাস্তায় "সুখচর গীর্জা" অথবা "বলরাম হসপিটাল" স্টপেজে নেমে গঙ্গা কিনারে রিক্সায় ৭/৮ মিনিটের পথ ভবাপাগলার আশ্রম।

১০) সাঁইবাবা মন্দির ঃ

সুখচরে বি. টি. রোডের গীর্জা স্টপেজের পশ্চিমে এই মন্দিরটি বর্তমানে আকর্ষণের কেন্দ্র। এই মন্দিরে রয়েছে সাঁইবাবার মূর্তি। অনেক মানুষ এই মন্দির দেখতে ও আরতি পূজা উপভোগ করতে দূরাদুরান্ত থেকেও আসেন।

১১) সুখচরের প্রাচীন দুর্গাপূজা ঃ

সুখচরের প্রথম দুর্গাপূজা নরসিংহ দত্ত ঘাট রোডে শেষ সীমানায় অবস্থিত মিত্তির বাড়ীর দুর্গাপূজা। পুজোটি মিত্তির বাড়ীর পুজো নামে খ্যাত ছিল। প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো সেই পূজা মন্ডপের আজ আর কিছু দেখা যায় না। কালের নিয়মে সেই পূজামন্ডপের আজ আর কিছুই নেই।

অতীত সুখচরে দুর্গাপূজার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষের 'সুখচরের আদ্য বিবরণ' ডায়েরী থেকে।

প্রয়াত যদুনাথ ঘোষের বাড়ীতে সে সময় দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল। সুখচরের বাসিন্দা বনমালি শেঠের বাড়ীতেও দুর্গাপূজার সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজা, রাস পূজা মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হোতো। সঁত্যহরি নন্দী ও কালী শেঠের বাড়ীতেও দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হোতো। এছাড়াও গোপাল চন্দ্র দে, দ্বারিকা নাথ প্রামাণিক, গোবিন্দ ঘোষ, গোপাল চন্দ্র শেঠ প্রভৃতি সুখচরের বাসিন্দাদের বাড়ীতে অতীতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হোতো। কোনো কোনোও বাড়ীতে আজও দুর্গা দালান দেখা যায়। এদের মধ্যে দত্তদের পূজার দালান,

হরি ভট্টাচার্য, খাঁ-দের বাড়ীর পূজার দালান, মজুমদারদের পাকা দালান, কার্তিক পাল, হরিসাধন সাঁতরার বাড়ীতেও পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত হোতো। বর্তমানে দু' একটি ছাড়া প্রায় সব পুজোই বন্ধ হয়ে গেছে।

১৮২৩ সাল বাংলা ১২৩০ সন পণ্ডিত নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সুখচর ঘোষপাড়ার দুর্গাপুজার পত্তন করেন। অতীতে এই পূজা একটি সাধারণ চালা ঘরে অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তীকালে ঐ দুর্গাপূজার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার জন্য বর্তমানে ঐ পূজামণ্ডপ নতুনভাবে গ্রামবাসীরা নির্মাণ করেন। বর্তমানে এই পূজাটি সুখচরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দুর্গাপূজা।

১৯৩৬ সালে সুখচর ওরিয়েন্টাল জিমনাসিয়ামের মাঠে সর্বজনীন দুর্গাপূজা শুরু হয়। বর্তমানে এখানে দুর্গামণ্ডপ গড়ে উঠেছে।

১৯৪৪ সাল বাংলা ১৩৫১ সুখচর কালীতলার মাঠে স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে সর্বজনীন দুর্গাপূজা শুরু হয়। বর্তমানে ঐ পূজা সুখচর কালীতলার নাট মন্দিরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যারা এই পূজার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরা সকলেই বর্তমানে প্রয়াত —পূর্ণ ব্রহ্ম শেঠ, মুবারী মোহন দে, কৃষ্ণ চন্দ্র গুহ, সত্যহরি নন্দী, কুটি দা, গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, হারাধন গঙ্গোপাধ্যায়, রাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৪৭ সাল সুখচর সবুজ সঙ্ঘের উদ্যোগে শুরু হয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব। পূর্বে ঐ পূজা শতদল বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হোতো। বিদ্যালয় নির্মিত হবার পর ঐ পূজা ক্লাব প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমানে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সর্বজনীন দুর্গা পুজাগুলি হল-প্রতাপ সঙ্ঘ নরসিংহ দত্ত ঘাট রোড, আমরা সবাই বাজারপাড়া, সর্বজনীন সুখচর আঞ্চলিক গ্রামবাসীবৃন্দের পুজো ঘোষপাড়া ক্লাব প্রাঙ্গণ, মিলন সঙ্ঘ কলুপাড়া, শশার পুজো কলুপাড়া, প্রগতি সঙ্ঘ হরিশচন্দ্র দত্ত রোড, রাজারোড সর্বজনীন পুজো সুখচর কর্মদক্ষ চন্দ্রচূড় স্কুলের নিকট, আমবাগানের পুজো, সুখচর গীর্জার পুজো, বালক সঙ্ঘ কবিরাজ মোড়, সুখচর সম্মিলনী, ভোলাগিড়ির মঠ, ভবা পাগলার আশ্রম এবং অন্যান্য।

সুখচরের টেরাকোটা মন্দির ও প্রাচীন মূর্তি কি সেন বংশের নিদর্শন—

সুখচরের প্রাচীনতম টেরাকোটা মন্দির বুদ্ধমূর্তি ও অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সুখচর মৌজায় গ্রামের উত্তর প্রান্তে সাপুড়িতলা বা দেউলপৌতায় টেরকোটার তিনটি শিবমন্দির প্রায় ধ্বংসের মুখে। টেলিগ্রাফ পত্রিকার সৌজন্যে জানা যায় যে এই মন্দির তিনটির নির্মাণ কাজ প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ১৭৩১ খৃঃ

সুখচর পঞ্চাননতলায় হাজার বছরের পুরাতন অর্ধনারীরশ্বর মূর্তি।

। নির্মাণ কর্তা রামকৃষ্ণ শেঠ। সুখচরের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ-পরিবারের পূর্ব পুরুষ। ওনার বংশধর কেদার শেঠ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়েছেন। এই মন্দির তিনটির বাঙলার আটচালা ধাঁচের ও টেরাকোটার কাজগুলিও অপূর্ব যা অবশিষ্ট রয়েছে। বর্তমানে এই মন্দিরগুলির সামনের অংশ প্রায় দৃশ্যমান হয় না, সামনের বসতি স্থাপনের জন্য। কিন্তু এই মন্দির তিনটি এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে এই অঞ্চলের প্রাচীন সম্পদশালী ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে।

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই মন্দির তিনটির নিকটে কয়েক বছর আগে খনন কার্যে পাওয়া পাথরে খোদাই একটি ১০ টন ওজনের শায়িত বুদ্ধ মূর্তি এবং বছর তিনেক আগে পঞ্চাননতলায় পাওয়া একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটি বল্লালসেনের সাময়িক বলে অনেকের অনুমান। অর্থাৎ ৫০০-৬০০ শতাধিক বৎসরের সভ্যতার স্মারক। এই তিন ভিন্ন প্রকার সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিচয় হলেও - এ সম্পর্কে ধারণা করা যায় যা এই অঞ্চলের প্রাচীন সাংস্কৃতি ও জীবনতার প্রতীক।

সুখচরের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন ঃ—

প্রাচীন সুখচর গ্রামের উত্তর প্রান্তে সাপুড়িতলা অঞ্চলে (বর্তমানে খড়দহ পৌরসভার অন্তর্গত সুখচর মৌজা) প্রায় ৩০০ বছরের পূরাতন তিনটি টেরাকোটা শিব মন্দির দেখতে পাওয়া যায় যেগুলি এই অঞ্চলের উন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে এবং এই পরিচয় আজও বর্তমান। যদিও এই মন্দিরগুলি বর্তমানে অবহেলিত ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত এবং এর চতুর্দিকে কিছু টিন আচ্ছাদিত ঘর নির্মিত হওয়ার ফলে এই প্রাচীন নিদর্শনগুলি সাধারণের চোখের আড়ালে রয়ে গিয়েছে। বট গাছের শিকড়, আগাছা ইত্যাদি এর চতুর্দিকে গজিয়ে ওঠার জন্য বর্তমানে টেরাকোটার এই অপূর্ব নিদর্শনগুলি জীবন্ত কীট পতঙ্গের বাসস্থান-পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকটি মন্দিরের বহির্ভাগে অপূর্ব টেরাকোটা কারুকার্য এবং জটিল নকশায় পরিপূর্ণ কিন্তু এর অধিকাংশই আজ ধ্বংসের পথে এবং স্থানীয় মানুষের কাছে জানা যায় যে এর অধিকাংশই চুরি হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের ভিতরের শিবলিঙ্গগুলির ও এখন কোন অস্তিত্ব নেই। ভালভাবে লক্ষ্য করলে টেরাকোটার তৈরি ড্রাগন, ময়ূর, সাপ, মানব সিংহের লড়াই ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলি ১৭৩১ সালে নির্মিত। এই মন্দিরগুলি প্রথমে জিন রেনোয়ার ১৯৫১ এর কালার ফিল্ম "দি রিভার"- এর মাধ্যমে নজরে আসে যেটি রুমার গডেন এর উপন্যাসের ওপর নির্মিত। সত্যজিত রায় এই চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কার্যে সহায়তা করেছিলেন।

এই মন্দিরগুলি নির্মাণের ব্যাপারে বিভিন্ন মত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এই মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ শেঠ। তাঁরই বংশধর প্রয়াত কেদার শেঠ ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র। তাঁরা সুখচরের শেঠ পরিবারেরই পূর্ব পুরুষ যাঁরা এই অঞ্চলের ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। এর পাশাপাশি আরও দুটি উল্লেখযোগ্য উন্নত ধর্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এটি বর্তমানে স্বামী মহাদেবানন্দ স্কুল নির্মাণের সময় শায়িত অবস্থায় একটি ১০ টন ওজনের প্রস্তর মূর্তির সন্ধান মেলে। এই স্থানটি পূর্বে শেঠের বাগান হিসাবে পরিচিত ছিল। এরই অনতিদূরে পঞ্চানন তলায় কয়েকবছর আগে খনন কার্য করার সময় এক অপূর্ব অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এটি সেন বংশ আমলের নিদর্শন হিসাবে অনেকেরই অনুমান। উপরে বর্ণিত তিনটি প্রাচীন নিদর্শন প্রমাণ করে সুখচর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে উন্নত জীবন ধারা ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রচলন ছিল। আনুমানিক ৬০০ বৎসর পূর্বে প্রথমে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, পরবর্তীকালে সেন বংশ আমলে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি ও তারও পরে শৈব সংস্কৃতির পরম্পরার ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কালে এই অঞ্চলে একদিকে যেমন টেরাকোটা শিল্প ও ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার লাভ করেছিল তেমনি চিনির উৎপাদন ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হওয়ার

ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ফলে এই অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে। তারই প্রতিফলন এই ধরনের মন্দির ও সংস্কৃতি। তাদেরই অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন মন্দির নির্মিত হয় যেগুলি টেরাকোটা শিল্পে সমৃদ্ধ। এই মন্দিরগুলি সম্বন্ধে তারাপদ সাঁতরা মহাশয় রচিত "ক্যালকাটাস টেম্পলস এন্ড মস্কস" নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে। ইংরেজী দৈনিক 'Tel egr aph' পত্রিকায় বিশেষ প্রতিবেদন আছে। এই ব্যাপারে পুরাতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সুখচরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক মানুষের অবদান। সমগ্র গ্রাম ছিল এক পরিবারের মত। সন্ধ্যে হলেই পাড়ার বড়দের শাসন ছিল বাড়িতে গিয়ে লেখাপড়া করার। অনাত্মীয় হলেও তাদের অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। বর্তমানে ইট — সিমেন্ট ও বহুতলের বাড়ীতে অনেক মানুষ এক সাথে থাকলেও আন্তরিকতার স্থান যেন অনেক শিথিল হয়ে এসেছে। পূজার সময়ে যেন সেই দূরত্ব অনেকটা মুছে সবাই একসঙ্গে আনন্দ উপভোগের আস্বাদন করতে উদ্‌গ্রীব।

পুরানো দিনের ঐতিহ্যগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই হারানো অতীত সম্পদ—যাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের প্রজন্মর দিক নির্দেশ হতে পারে।

অবস্থান গত ভাবে সুখচরের বামে পানিহাটি, ডাইনে খড়দহের পুণ্য মাহাত্মের মাঝে আর এক অনুচ্চারিত ঐতিহ্য যেন বামে বলরাম ও ডাইনে জগন্নাথের পরশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ডঃ বৃন্দাবন দাস কাঠিয়া বাবা, স্বামী সোমেশানন্দ, নির্মল ঘোষ (বিধায়ক, পানিহাটি ও মুখ্য সচেতক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), স্বপন ঘোষ (পৌরপ্রধান, পানিহাটি পৌরসভা), তাপস পাল (পৌরপ্রধান, খড়দহ পৌরসভা), রামব্রহ্ম শেঠ, তাপস মুখোপাধ্যায়, শ্যামব্রহ্ম শেঠ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কৃশানু ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত বিশ্বাস, দীপক কুমার নাগ, পরমেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকনাথ ঘোষাল, ডঃ শক্তিপদ মুখার্জী, ডাঃ সন্মথ ঘোষ, অজয় ঘোষ, কালীদাস মুখার্জী, গোবিন্দলাল শেঠ, সুভাষ নন্দী, হেরম্ব চক্রবর্তী, মলয় মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পাঁচুগোপাল সাধুখাঁ, সুভাষ সিন্‌হা, তপন শেঠ, স্বপন চৌধুরী, জুলী সরকার, সুভাষ গাঙ্গুলী, স্বপন দাস, স্বপন গাঙ্গুলী, বিশ্বজিত কুণ্ডু, প্রদীপ বোস, তরুণ শেঠ, খগেন্দ্রনাথ সাঁতরা, শম্ভুনাথ ঘোষ, মানিকলাল চক্রবর্তী।

আলোকচিত্র সৌজন্যে - চিন্ময় রায়, সুদীপ্তা শেঠ, সুদীপ্ত পাত্র, দেবজ্যোতি শেঠ, পবিত্র নন্দী। সহযোগিতায়-DRS Tech - এর কর্মীবৃন্দ।

শারদ শুভেচ্ছা

বিবর্তন পত্রিকার পাঠক - পাঠিকা, গ্রাহক - গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপন দাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পুজোর দিনগুলি আনন্দে উপভোগ করুন। পরবর্তী সংবাদ পাক্ষিক প্রকাশিত হবে ১ অক্টোম্বর ২০১৭।

বিবর্তন কর্তৃপক্ষ